প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সুশাসন

The Administrative System and Good Governance

৬

ভূমিকা
Introduction

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের পথে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে। এই দেশের গণতন্ত্রায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল সামরিক শাসন। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। গণতন্ত্রের পাশাপাশি সুশাসনও বাংলাদেশের বহুল আলোচিত বিষয়। সুশাসনের সাথে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও কাঠামো, নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়া, সরকারের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং মাঠ প্রশাসনের নীতি বাস্তবায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক,ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। ই-গভর্নেন্স বা ডিজিটাল গভর্নেন্স বর্তমানে কীভাবে সরকারি সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে, নাগরিক-সেবা কতটা সহজলভ্য এবং হয়রানিমুক্ত হয়েছে তা থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সুশাসন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায়। বাংলাদেশের সুশাসন, টেকসই উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং কীভাবে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব– সে বিষয়ে এই ইউনিটে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৬.১ : বাংলাদেশের বিভিন্ন শাসনামল
পাঠ- ৬.২ : বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো
পাঠ- ৬.৩ : ই-গভর্নেন্স ও বাংলাদেশ
পাঠ- ৬.৪ : বাংলাদেশে সুশাসন : চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়
পাঠ- ৬.৫ : বাংলাদেশের পরিবেশ ও উন্নয়ন

মুখ্য শব্দ	গণতন্ত্র, সামরিক শাসন, প্রশাসনিক ইউনিট, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ই-গভর্নেন্স, ডিজিটাল বাংলাদেশ, সুশাসন, পরিবেশ, টেকসই উন্নয়ন

পাঠ-৬.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন শাসনামল
Different Political Regimes of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বিভিন্ন শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সামরিক শাসনকাল ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এদেশে একাধিক ব্যবস্থার সরকার বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির, যেখানে প্রধানমন্ত্রী হলেন সাংবিধানিকভাবে সরকার প্রধান। এই সংসদীয় ব্যবস্থাটি সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯১ সালে গৃহীত হয়েছিল। এর আগে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পুনরায় গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসে। কিন্তু ২০০৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় এবং তৎকালীন সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেন। পরবর্তীতে ২০১১ সালে বিচার বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিলুপ্ত করে।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামল (১৯৭২-১৯৭৫)

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের বন্দী অবস্থা থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর এক আদেশ বলে তিনি দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মধ্য দিয়ে সরকার গঠন করে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক লীগ নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী, উশৃঙ্খল ও চাকরিচ্যুত সদস্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত পুনর্গঠন ও উন্নয়ন। কেননা মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগও অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। এছাড়া সদ্যস্বাধীন দেশে আইন-শৃঙ্খলার ভীষণ অবনতি ঘটে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা তখনো অস্ত্র জমা দেননি। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মিশন নিয়ে অনেকে পরিকল্পিতভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে তৎপর হন। সেইসাথে স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিও সরকারের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে নানা ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা অব্যাহত রাখে। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে এগুলো ক্রমশ বড় বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ সফলতার সাথেই মোকাবিলা করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সরকারের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনীকে সেদেশে ফেরত পাঠানো। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সচল করা, খাদ্য সংগ্রহ এবং সরবরাহ স্বাভাবিক করাও বঙ্গবন্ধু সরকারের বড় কৃতিত্ব। এছাড়া তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের

পুনর্বসান ও গৃহ নির্মাণে সহায়তা প্রদান, মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন এবং একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু সরকার বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। সবার জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, সকল প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণের মাধ্যমে দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সোপান চালু করেন। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করতে সক্ষম হয়।

জিয়ার শাসনামল (১৯৭৫-১৯৮১)

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক আহমেদ সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী অংশের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এক সেনা অভ্যুত্থানে খন্দকার মোস্তাক ক্ষমতাচ্যুত হন। পরবর্তীতে ৭ নভেম্বর এক পাল্টা সেনা অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিহত হন এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক উত্থান ঘটে। প্রথমে বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক করা হলেও ১৯৭৬ সালে ৩০ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়া নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরের বছর বিচারপতি সায়েম স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ান এবং জিয়া রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় আরোহণ করে জেনারেল জিয়া তার শাসনকে বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে ১৯৭৮ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া গণভোটের আয়োজন, ১৯৭৭ সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচন, ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ইত্যাদি পদক্ষেপ ছিল তার বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ। জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। যেমন, ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" সংযোজিত হয়। সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার লিপিবদ্ধ করা হয়। বাঙালির পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ সংযোজিত হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে জিয়াউর রহমান নিহত হন।

এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-১৯৯০)

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের পর বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে বিএনপি কিছুদিন ক্ষমতায় ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় আসেন। ক্ষমতায় এসে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের মত তিনিও বেসামরিকীকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। এ লক্ষ্যে তিনি রাজনৈতিক দল গঠনের পাশাপাশি গণভোট অনুষ্ঠান, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন করেন। তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম সংশোধনী হয়। এরশাদ তাঁর শাসনামলে তীব্র গনআন্দোলনের সম্মুখীন হন। ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনের মাত্রা এত প্রকট হয় যে ৬ ডিসেম্বর তিনি ক্ষমতা থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন।

খালেদা জিয়ার শাসনামল (১৯৯১-১৯৯৬)

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে। সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া শপথ গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এর মধ্যে। ড. রশিদ (২০০১) তাঁর *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* (১৭৫৭- ২০০০) বই এ উল্লেখ করেছেন, এই নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াতের নির্বাচনী সমঝোতা ছিল স্পষ্ট। এই নির্বাচনে সকল দক্ষিণপন্থী দল আওয়ামী লীগের বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই সরকারের মেয়াদের শেষের দিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা শুরু হয় মূলত মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে। আওয়ামীলীগসহ তৎকালীন অন্যান্য বিরোধী দলগুলো ভোটে কারচুপির অভিযোগ আনে এবং এর প্রেক্ষিতে সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু বিএনপি সরকার এই আন্দোলনকে গ্রাহ্য না করে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করে। বিরোধী দলসমূহ এই নির্বাচন বয়কট করে। তীব্র গণআন্দোলনের মুখে

১৯৯৬ সালের মার্চ মাসেই বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেন। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইন পাশ করে সরকার পদত্যাগে বাধ্য হন।

শেখ হাসিনার শাসনামল (১৯৯৬-২০০১)

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৬ টি আসন এবং বিএনপি পায় ১১৬টি আসন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দেশে নানামুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বহারা-চরমপন্থিদের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ, দুস্থদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অসংখ্য ইতিবাচক কর্মকাণ্ড আওয়ামী লীগ সরকারের এই মেয়াদকালে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘাতকদের বিচারের আওতায় আনাও শেখ হাসিনা সরকারের অন্যতম সাফল্য। বস্তুত এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেশের ইতিহাসকে কলঙ্কমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

খালেদা জিয়ার শাসনামল (২০০১-২০০৬)

২০০১ সালের ০১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি'র নেতৃত্বে চারদলীয় জোট গঠিত হয়। জোটের অন্যান্য দল হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্য জোট এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)। এই চারদলীয় জোট ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করে এবং বেগম খালেদা জিয়া তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জোট সরকারের এই মেয়াদে দেশে স্বাধীনতাবিরোধী দৌরাত্ম বৃদ্ধি পায় এবং জঙ্গিবাদের প্রকাশ্য বিস্তার ঘটে। সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগও উত্থাপিত হয়।

২০০৬ সালে জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা শুরু হয়। সরকার ও বিরোধী দলের অনড় অবস্থানে দেশে সংঘাত-সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহাম্মদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ এবং দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ঐদিনই ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেনা সমর্থিত এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁদের নির্দিষ্ট মেয়াদের পরও অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতায় ছিল। নানাবিধ বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের ফলে এই সরকার ক্রমশ সমালোচিত হচ্ছিল এবং জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজনের মাধ্যমে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবসান ঘটে।

শেখ হাসিনার শাসনামল (২০০৯-২০১৪)

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করে। এ নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৩০টি এবং জোটগতভাবে ২৬৩টি আসনে বিজয়ী হয়েছিল। নির্বাচনের ইশতেহার হিসেবে আওয়ামী লীগ 'ভিশন ২০২১' প্রকাশ করে। 'ভিশন ২০২১' মূলত স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে বাংলাদেশের অবস্থান কেমন হবে তার একটি রাজনৈতিক রূপরেখা। এই ইশতেহারের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের দরিদ্রতা দূর করে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। নির্বাচনি ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার। মূলত তরুণ ভোটারদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিরাট সাফল্য অর্জন করে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকারের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদকালে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলোর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি, অব্যাহতভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬% এর বেশি ধরে রাখা, দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধের সমাধান এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নও আওয়ামী লীগ সরকারের একটি বড় অর্জন। একইভাবে, জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত শান্তি মডেল গ্রহণ এবং জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium

Development Goals- MDGs) অর্জন সরকারের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অর্জনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সরকারের এ মেয়াদে জাতির জনকের হত্যাকারীদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা, স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস বাহিনীর নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার ক্রার্যক্রম শুরু ও রায় বাস্তবায়ন করা, জঙ্গীবাদ দমন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে বিবেচিত।

শেখ হাসিনার শাসনামল (২০১৪-২০১৯)

২০১৪ সালের ০৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও এর মহাজোট নিরঙ্কুশ ভোটে বিজয়ী হয়। সংসদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৬৭ টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে এবং দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সমুদ্রসীমা নির্ধারণে আন্তর্জাতিক মামলায় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জয়লাভ, স্থলসীমা চুক্তি এবং ছিটমহল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসা সরকারের অন্যতম সাফল্য। এ সরকারের আমলেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করেছে (চূড়ান্ত স্বীকৃতি মিলবে ২০২৪ খ্রি.)। মাথাপিছু আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলারের বেশি হওয়া, দারিদ্র্যের হার কমিয়ে ২১.৮ শতাংশে নামিয়ে আনা সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে পরিগণিত। কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি নয়, শিক্ষার হার, নারী শিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত, ঝরে পড়া হ্রাস; গড় আয়ু, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস এবং সামগ্রিক জীবনমানের সূচকে বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে অধিকতর সাফল্য অর্জনকারী দেশ হিসেবে স্বীকৃত।

শেখ হাসিনার শাসনামল (২০১৯-বর্তমান)

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট জয়লাভ করে। ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৫৯টি এবং জোটগতভাবে ২৮৮টি আসনে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বারের (মোট চতুর্থবার) মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্থিতিশীলতা, রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, দুর্নীতি দমনে কঠোর পদক্ষেপ, সুশাসনের দৃঢ় অঙ্গীকার, জঙ্গীবাদ দমন, ডেল্টা প্লান ২১০০, ২০৪১ সালে উন্নত বিশ্বে উত্তরণ, শিক্ষাঙ্গনে ব্যাপক উন্নয়ন, আইটি পার্কসহ ইকোনমিক জোন স্থাপন, ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে আশ্রয় প্রদান, রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পদ্মাসেতু নির্মাণ, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ, পায়রা সামুদ্রিক বন্দর নির্মাণ, সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়ন, কোভিড-১৯ মোকাবিলা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সচল রাখা ইত্যাদি দেশে-বিদেশে প্রশংসা অর্জন করেছে।

সারসংক্ষেপ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যার পর দেশে শুরু হয় সামরিক শাসন। সামরিক শাসকরা বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের শাসনকে বৈধ করার চেষ্টা করেন। এই বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তারা রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠাসহ জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন এবং গণভোটের আয়োজন করেছিল। পরবর্তীতে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রচলন ঘটলেও গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হয়। এর মূলে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক আস্থাহীনতা, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অভাব, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব, সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রভৃতি। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ এবং উদার গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।

পাঠ-৬.২ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো
The Administrative Structure of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো পর্যালোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসনিক কাঠামোর বিবরণ দিতে পারবেন।

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার সহায়ক শক্তি হিসেবে শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো দরকার হয়। সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোতে কিছু প্রশাসনিক ইউনিট (Administrative Unit) থাকে যা উন্নয়ন নীতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই ইউনিটগুলো সরকারের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের পরিকল্পনা, বাজেট ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় যা সুশাসনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দুইটি স্তর রয়েছে। এগুলো হলো- ক) কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো এবং খ) মাঠ পর্যায় প্রশাসনিক কাঠামো। এই কাঠামোর প্রশাসনিক ইউনিটগুলো হচ্ছে ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪৮৯টি উপজেলা, প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদ, ১২টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩৩০টি পৌরসভা।

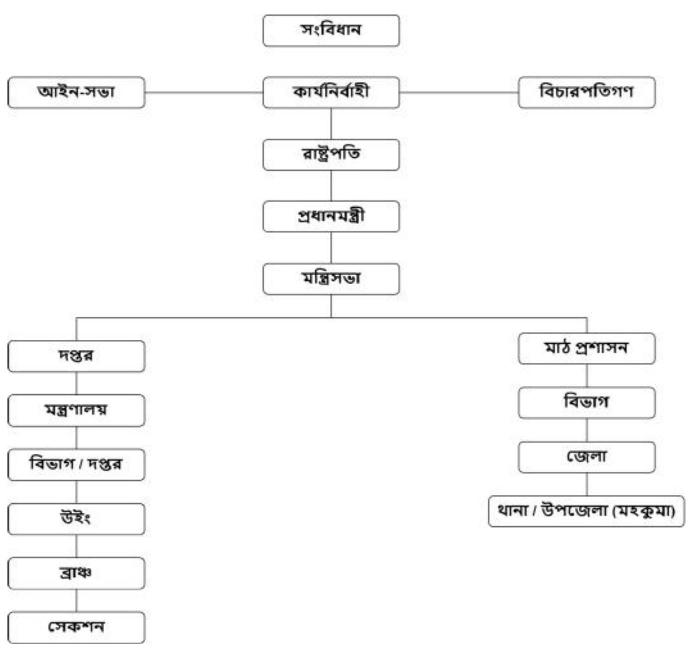

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো (তথ্য উৎস: Panday, 2019; Kalimullah et al. 2013)

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রথম স্তর হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো (সচিবালয়) যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর নিয়ে গঠিত। সচিবালয় হলো প্রশাসনিক কার্যাবলি এবং সমস্ত সরকারি কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র। সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত Rules of Business এর নিয়ম অনুসারে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের কার্যাদি নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও সচিবালয়ের নির্দেশাবলী (Secretariate Instructions) নামে আলাদা একটি ডকুমেন্টও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কার্যাবলি নির্ধারণ করে থাকে। সচিবালয় মূলত প্রশাসনিক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনার মূল্যায়ন, সংসদে মন্ত্রীদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা, শীর্ষ স্তরের প্রশাসন পরিচালনা, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াদি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে ।

প্রধানমন্ত্রী নিজে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক পরামর্শে মন্ত্রীগণ তাঁদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ। মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। সচিব একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হন এবং তিনিই এর শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। সংশ্লিষ্ট সচিব এবং মন্ত্রী উভয়ে নিজ নিজ মন্ত্রণালয় সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ।

প্রধানত এক বা একাধিক বিভাগ নিয়ে একটি মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। সকল কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত এই বিভাগসমূহকে 'উইং, 'ব্রাঞ্চ' এবং 'সেকশন' এ বিভক্ত করা হয়। একটি উইং হচ্ছে মূলত একজন যুগ্ম-সচিব বা অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি উপ-বিভাগ। ব্রাঞ্চ বলতে একাধিক সেকশনকে একত্রে বোঝানো হয় যার নেতৃত্বে একজন উপ-সচিব বা সমপদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা দায়িত্বে থাকেন। অপরদিকে একটি সেকশন হলো একজন সহকারী সচিব অথবা একজন সিনিয়র সহকারী সচিবের দায়িত্বে থাকা একটি প্রশাসনিক ইউনিট।

বাংলাদেশের মাঠ পর্যায় প্রশাসনিক কাঠামো (স্থানীয় সরকার)

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর হলো মাঠ প্রশাসন। মাঠ প্রশাসনের প্রধান দু'টি ক্ষেত্র হচ্ছে জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন। জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয় এবং নেতৃত্বে রয়েছে বিভাগীয় প্রশাসন। এটি মূলত প্রশাসন বা আমলাতন্ত্রের বিন্যাস। অন্যদিকে সরকারের কাঠামোগত বিন্যাসে মাঠ পর্যায়ে রয়েছে স্থানীয় সরকার। স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি এবং সিদ্ধান্তসমূহ মাঠ প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হয়। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও নাগরিকসেবা নিশ্চিতকরণ এবং কল্যাণমুখী সমাজ গঠনে স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের যুগপৎ এবং সমন্বিত কর্মসূচির বিকল্প নেই। তবে সামগ্রিক উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসনের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হয়।

মূল্যায়ন

বাংলাদেশে প্রশাসনিক কাঠামো কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো 'ধীরগতি'। প্রশাসনিক কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির অভাবে কল্যাণ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। এছাড়া আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে দুর্নীতি ও অদক্ষতার অভিযোগে রয়েছে। সনাতনী আইনী কাঠামো নিয়ে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার কারণে এটি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ এবং স্বচ্ছ নয়। প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আরেকটি বড় বাধা হলো স্বজনপ্রীতি, যার মাধ্যমে সরকারি নিয়োগ, ক্রয়-বিক্রয়সহ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা ধরনের অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়। এ ধরনের ব্যবস্থায় সরকারি সম্পদের অপচয় এবং সমাজে অসমতা ও বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের প্রশাসনে মুদ্রা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সম্পত্তিগুলোকে অবহেলা করার একটি প্রচলিত প্রবণতা রয়েছে। স্থানীয় সরকারের কাছে তহবিলের প্রবাহ সময়োপযোগী এবং মসৃণ নয়। তদুপরি, এই তহবিল সঠিকভাবে ব্যবহৃত না হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ সুবিধাবঞ্চিত হয়। প্রশাসনের কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়হীনতা, কার্যকরী পরিকল্পনা, অর্থায়ন এবং বাস্তবায়নের মধ্যে সমন্বয়হীনতা বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর বড় দুর্বলতা। সর্বোপরি, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অভাবে কিছু সুনির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ উন্নয়ন কার্যক্রম স্থানীয়

সরকারের আওতাধীন থেকে গেছে। তদুপরি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যথা পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ড মাঠপর্যায়ে ততটা কার্যকর নয়। প্রকৃতপক্ষে, স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের কেন্দ্রীয় সংগঠন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করার দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। ফলে প্রকল্প পরিচালনায় স্থানীয় সরকার বা মাঠ প্রশাসনের সক্ষমতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমলাতন্ত্রের কার্যকর বিরাজনীতিকরণ প্রয়োজন। এজন্য জাতীয় সংসদের আইন প্রণেতাগণের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। জনপ্রতিনিধিগণকে তাদের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব এবং ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদানও কার্যকর প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনের সাফল্যের জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণও অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ:

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো মূলত দুই স্তর বিশিষ্ট। এগুলো হলো- কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং মাঠ প্রশাসন। একইভাবে সরকার কাঠামোও কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয়– এ দু'টি স্তরে বিন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার মূলত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরদিকে স্থানীয় সরকার বা মাঠ প্রশাসন মূলত সমন্বিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি, আদর্শ, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে। স্থানীয় উন্নয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায়ও এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনের শাসন, সুষম উন্নয়ন এবং নাগরিক সেবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে পারস্পরিক সমন্বয় এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য।

পাঠ-৬.৩ ই-গভর্নেন্স ও বাংলাদেশ
E-Governance and Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ই-গভর্নেন্স বলতে কী তা বলতে পারবেন;
- ই-গভর্ন্যান্সের বিভিন্ন উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্সের প্রকৃতি এবং কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সকল প্রকার সরকারি ও বেসরকারি সেবা-প্রদান, 'ব্যাক-অফিস' কার্যক্রম, তথ্য আদান-প্রদান, লেনদেন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমে ইলেক্ট্রনিক, কম্পিউটিং এবং আইসিটির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে, কম খরচে, সঠিকভাবে এবং সহজে সকল ধরনের কর্মকাণ্ড বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালনা করার প্রক্রিয়াকে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্সে সরকারি-বেসরকারি সেবা ও তথ্যাদি আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াটি সরকার থেকে সরকারি সংস্থা (Government to Government Agencies i.e. G2G), সরকার থেকে নাগরিক (Government to Citizen i.e. G2C), নাগরিক থেকে সরকার (Citizen to Government i.e. C2G), সরকার থেকে সরকারি কর্মচারী (Government to Employee i.e. G2E) এবং/অথবা সরকার থেকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে (Government to Business i.e. G2B) সক্রিয়ভাবে কাজ করে।

অন্যভাবে বলা যায় যে, শাসন ব্যবস্থা ও সরকারি-বেসরকারি কার্য-প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক্স বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্নেন্স। আর সে কারণেই ই-গভর্নেন্সকে অনেক সময় ডিজিটাল গভর্নেন্সও বলা হয়ে থাকে।

কোনো একটি দেশে সুপ্রশাসনের জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্য। আর ডিজিটাল গভর্নেন্স প্রচলনের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব। ফলে নাগরিক-হয়রানি এবং সেবা-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় হয়রানির অবসান ঘটে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সরকার থেকে নাগরিক (Government-to-Citizen) ই-গভর্নেন্স

সরকার থেকে নাগরিক (G2C) ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য হলো আইসিটি এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকদের দ্রুত এবং স্বচ্ছ ও সহজ উপায়ে বিভিন্ন পরিসেবা প্রদান করা। এর মাধ্যমে সরকার এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা। G2C এর আওতায় অনলাইনে বসে রাষ্ট্রীয় সেবা পাওয়ার জন্য আবেদন করা, এমনকি সেবা গ্রহণ, মতামত কিংবা অভিযোগ প্রদান, অনলাইনে ভোটদান ইত্যাদিসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রয়েছে যা রাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার নাগরিকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানা প্রকার ই-গভর্নেন্স প্রকল্প চালু করেছে যার মধ্যে অন্যতম হলো ঘরে বসে বিভিন্ন সরকারি সেবার জন্য অনলাইনেই আবেদন এবং বিভিন্ন পরিসেবার বিল প্রদান করা, টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, ফোন-কলের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রাপ্তি, জরুরি সহায়তার জন্য '৯৯৯' সার্ভিস ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কর্মচারী থেকে সরকার (Employee-to-Government) ই-গভর্নেন্স

কর্মচারী থেকে সরকার ই-গভর্নেন্স একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল গভর্নেন্স প্রক্রিয়া। ইন্টারনেট, কম্পিউটার এবং অন্যান্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকার তার নিজস্ব সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রাখতে এবং সরকারি কার্যকলাপ সহজ করতে সহায়তা করে। অতীতে যেখানে সরকারি কর্মচারীরা তাদের নিজেদের মধ্যে ফাইল এবং তথ্যের আদানপ্রদান করতেন কাগজপত্রের মাধ্যমে, ই-গভর্নেন্সের কারণে তা এখন অনলাইনে বা ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে করা যাচ্ছে। পূর্বে যেমন বেতন-ভাতা, অফিসের নানাবিধ কাজের জন্য সরকারী কর্মচারীদের কাগজে আবেদন করতে হতো এবং অনেক সময়ক্ষেপণ হতো, ই-গভর্নেন্সের কারণে এখন অনলাইনে আবেদন এবং স্বল্পতম সময়ে আবেদন নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ, তাদের নিকট থেকে তথ্য, মতামত, অভিযোগ নেওয়া, তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত করা, অনলাইনে ভিজ্যুয়াল, অ্যানিমেশন, ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মচারীদেরকে ট্রেনিং প্রদান এমনকি নীতিনির্ধারণী অনেক সভা-

সেমিনারও অনলাইনে (ভার্চুয়াল) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুতরাং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট ই-গভর্নেন্সের বিষয়টি এখন আর নতুন নয়, বরং তাদের প্রতিদিনের চর্চার বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সরকার থেকে সরকার (Government-to-Government) ই-গভর্নেন্স

সরকার থেকে সরকার (G2G) হলো এক সরকারি সংস্থা, বিভাগ, কর্তৃপক্ষের সাথে অন্যান্য সরকারি সংস্থা, বিভাগ এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনলাইনভিত্তিক মিথষ্ক্রিয়া। সরকার থেকে সরকার ই-গভর্নেন্স দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো অভ্যন্তরীণ যা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, এজেন্সি, সংগঠন এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে; এরূপ G2G ই-গভর্নেন্স এর উদাহারণ হলো যুক্তরাজ্যের সরকারি গেটওয়ে। আরেকটি হলো বাহ্যিক যা সরকারের একাধিক ইনফরমেশন সিস্টেমকে একত্রিত করে। এরূপ G2G ই-গভর্নেন্স এর উদাহারণ হলো ইউরোপিয়ান কমিশন কর্তৃক পরিচালিত শেঞ্জেন ইনফরমেশন সিস্টেমের (SIS)। তবে বর্তমানে কেবল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নয়, আন্তঃরাষ্ট্র যোগাযোগ, সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে G2G ই-গভর্নেন্স কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে সরকারি দপ্তরগুলোর ফাইল সংরক্ষণ, আন্তঃবিভাগ, দপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের জন্য ডিজিটাল ফাইলিং সিস্টেম চালু হয়েছে। সরকারের আইসিটি মন্ত্রণালয় ই-গভর্নেন্স সিস্টেমকে আরো বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তথ্য মন্ত্রণালয় সরকারের বিভিন্ন তথ্য, সেবা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট রয়েছে। সরকারের কেন্দ্রীয় এবং আন্তঃবিভাগীয় তথ্য, সেবা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে একটি ফ্রেমওয়ার্ক ও নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে যা সরকার থেকে সরকার ই-গভর্নেন্স এর অংশ।

সরকার থেকে ব্যবসা (Government-to-Business) ই-গভর্নেন্স

সরকারি থেকে ব্যবসা (G2B) ই-গভর্নেন্স হলো এমন একটি অবাণিজ্যিক মিথষ্ক্রিয়া যা অনলাইনের মাধ্যমে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। G2B বলতে সরকারি সংস্থা এবং ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে কার্যপ্রবাহকে বোঝায়। G2B এর উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করা, তাৎক্ষণিক তথ্য সরবরাহ করা এবং ই-ব্যবসায় (E-commerce) ডিজিটাল যোগাযোগ ও লেনদেন করা।

বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ই-গভর্নেন্স চালু করার ক্ষেত্রে সরকার বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে আইসিটিকে অর্থনীতির অন্যতম খাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এই ক্ষেত্রকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার বৈষম্য দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ, সরকারি এবং অন্যান্য খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্পকে বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের ই-গভর্নেন্সের বিশেষ কতকগুলো উদ্যোগ এখানে তুলো ধরা হলো:

ই-নথি: ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তি এবং অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ই-নথি সেবা চালু করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ই-নথি ব্যবহৃত হচ্ছে।

সরকারি সার্টিফাইং অথরিটি প্রতিষ্ঠা: দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন ও Public Key Infrastructure (PKI)-এর উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ প্রতিষ্ঠা করেছে।

জাতীয় পরিচয়পত্রকে ডিজিটালকরণ: রাষ্ট্রের হাতে সংরক্ষিত নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র চালু করা হয়েছে।

সরকারি কর্মচারীদের তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমকে ডিজিটালাইজেশন: সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২০১৬ সালে সকল সরকারি কর্মকর্তাদের কাজের গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে চ্যাটিং, অনলাইন অডিও ও ভিডিও কল, ফাইল শেয়ারের ইত্যাদি সুবিধা সহকারে আলাপন নামে একটি ম্যাসেঞ্জার অ্যাপ চালু করেন।

ডিসি ও ডিআরএস: বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে ইনফো-সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে "কনটেইনার ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার" স্থাপন করেছে। এর ফলে কোনো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ডাটা-সেন্টার যদি নষ্ট/ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই রিকভারি সেন্টার সাহায্য করতে পারে।

ন্যাশনাল হেল্প ডেস্ক চালুকরণ: জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণকে নানান তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে মোবাইল ফোনভিত্তিক (৯৯৯) হেল্পডেস্ক চালু করে যার মাধ্যমে নাগরিক বিনামূল্যে ফোন করে হাসপাতাল, পুলিশ, ফায়ার স্টেশন নম্বর, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যসহ জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত নানান তথ্য জানতে পারবেন।

বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধকরণ: বাংলা ভাষাকে সহজীকরণ, বাংলা লিখিত নমুনা (কর্পাস) ও বাংলা ফন্টের মান উন্নয়ন, এবং বিশ্বমানের বাংলা কম্পিউটিং চালু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে "গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ" নামের এক প্রকল্প চালু করে।

ডিজিটাল জোন গড়ে তোলা: বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজারের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মহেশখালীকে একটি "ডিজিটাল আইল্যান্ড" হিসেবে গড়ে তুলবার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে "কনভার্টিং মহেশখালী ইনটু ডিজিটাল আইল্যান্ড" নামের একটি প্রকল্প হাতে নেয়। বাংলাদেশ সরকার যেন পরবর্তীতে অন্যান্য প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাকেও সহজে ডিজিটালে রূপান্তর করতে পারে সেই লক্ষ্যেই মূলত এই প্রকল্পকে একটি মডেল হিসেবে হাতে নেওয়া হয়, এবং ২০১৭ সালে তা উদ্বোধন করা হয়।

ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প: বিচারিক ব্যবস্থার সকল যোগাযোগ, ফাইলিং, সাক্ষ্য-প্রমাণ রেকর্ডিং ও সংরক্ষণ, মামলার নথি সংরক্ষণ, আদেশ-রায় প্রেরণ ও প্রদর্শন ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালে ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প হাতে নেয়। ২০১৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে উচ্চ আদালতের উভয় বিভাগের মামলার তথ্যাদি দৈনন্দিন কার্যতালিকা সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। ২০১৭ সালের মার্চ থেকে অনলাইনেই জামিন আদেশ যাচাই করা যাচ্ছে। ২০১৫ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট অনলাইন বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০১১ সাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার, আদেশ, নির্দেশনা অনলাইন নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাচ্ছে।

ফোর টায়ার ডাটা সেন্টার: সরকারি ও বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও শেয়ারিংয়ের পাশাপাশি নানান প্রযুক্তিকে সহজে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে দেশের বৃহত্তম ও বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম জাতীয় ফোর টায়ার ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালুকরণ: সরকারি দপ্তর এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সেবা অথবা পণ্যের মান সম্পর্কে যদি জনগণের কোন অসন্তোষ বা মতামত থাকে তবে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১৯ সালে এই অনলাইন ভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু করে।

এর বাইরেও সরকারের নেওয়া অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো দেশব্যাপী হাই-টেক পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা, স্থায়ী ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার বিতরণ করা, আইটিকে শিক্ষা পাঠ্যক্রমের আওতায় আনা, সকল শিক্ষকদের জন্য আইটিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এছাড়া সুশাসন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য ই-গভর্নেন্সকে বাংলাদেশের পলিসি এজেন্ডার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রশাসনিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার তথ্য প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। পাশাপাশি, সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ অন্যান্য পরিকল্পনায় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মূল্যায়ন

বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার সব থেকে বড় বাধা হলো দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব। যার ফলে শহরাঞ্চলে ইন্টারনেট ব্যবস্থা মোটামুটি ভালো থাকলেও গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও, মোবাইল অপারেটরদের কলরেট এবং ইন্টারনেট প্যাকেজের দাম সাধ্যের মধ্যে না হওয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এখনও ইন্টারনেটের সুব্যবহার থেকে বঞ্চিত, যা ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। পাশাপাশি, এখনও আমাদের দেশে ইনফরমেশন টেকনোলোজিতে দক্ষ জনবল নেই, যার কারণে সরকার অনেক পরিকল্পনা করলেও সেগুলোর বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ হয়ে যায়।

নাগরিকরা যেন ই-গভর্নেন্সের ব্যবহার এবং এর সুফল সম্পর্কে অবগত হতে পারে, সেজন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তিতে সার্বজনীন প্রবেশ্যতা, সংযোগ, প্রাপ্যতা, এবং সাশ্রয়ী মূল্য নিশ্চিত করা জরুরি। পাশাপাশি,

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে জনগণের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কার্যকরী আইন তৈরি এবং সংস্কার করা উচিত। সর্বোপরি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যেকোনো ধরনের প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা যেন না হয় সে ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

সারসংক্ষেপ:

শাসন ব্যবস্থা ও সরকারি কার্য-প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক্স বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্নেন্স। মূলত সরকারি সেবা নাগরিক থেকে সরকার, সরকার থেকে সরকারি সংস্থা, সরকার থেকে নাগরিক, সরকার থেকে কর্মচারী, অথবা সরকার থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ই-গভর্ন্যান্সের আওতাভুক্ত। বাংলাদেশ সরকার বৈষম্যদূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ, সরকারি এবং অন্যান্য খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যার ফলে সুশাসন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য নিরসনে ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পাঠ-৬.৪ বাংলাদেশে সুশাসন : চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়
Good Governance in Bangladesh: Challenges and Way-out

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

গভর্নেন্স বলতে বোঝায়, প্রশাসনিক দক্ষতার সাথে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। মূলত আশির দশকে উন্নয়ন অধ্যয়নে গভর্নেন্স এবং গুড গভর্নেন্স এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা কীভাবে সমাধান করা প্রয়োজন সেই ধারণার প্রেক্ষাপটে সুশাসন বিষয়ে তাত্ত্বিকরা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আলোচনা শুরু করেন। কেননা উন্নয়নশীল দেশগুলো তাঁদের নাগরিকদের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছিল। পাশাপাশি দেশগুলোর বেসরকারী খাতের যথাযথ বিকাশের জন্য নেতৃত্বের সঙ্কট, স্বচ্ছতা ও প্রশাসনের জবাবদিহিতার অভাব, অকার্যকর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি দেখা দিচ্ছিল। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সুশাসন অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক নীতি পর্যায়ে এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ রয়েছে যার কারণে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। যেহেতু বাংলাদেশ সকল সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে, সেহেতু এই চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকগণের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

সুশাসনের সংজ্ঞা

সুশাসন হলো সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কীভাবে জনসাধারণের বিষয়াদি এবং জনসম্পদকে পরিচালনা করবে সেই প্রক্রিয়াকে বুঝায়। R. A. W. Rhodes তাঁর Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability বই এ সুশাসনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, সুশাসনকে চিহ্নিত করা যায় স্ব-সংগঠিত এবং আন্তসংগঠনের অন্তর্ভুক্তি, সম্পদের আদান-প্রদান এবং রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে। (Good governance involves the self- organizing and interorganizational networks characterized by interdependence, resource-exchange, rules of the game and significant autonomy from the state).

সুশাসনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মাত্রা রয়েছে যার মাধ্যমে কোনও দেশের শাসনের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন তাত্ত্বিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্নভাবে সুশাসনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে World Bank উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সুশাসনের ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশকের বিষয়ে উল্লেখ করেছে। এগুলো হলো:

১। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা নিশ্চিত করতে হবে যা নিয়মিত নির্বাচন এবং রাজনৈতিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা যেতে পারে।

২। প্রশাসনের বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং পেশাদার গোষ্ঠীর সংগঠন করার এবং সেখানে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

৩। মানবাধিকার রক্ষার জন্য, সামাজিক ন্যায়বিচারকে সুরক্ষিত করার জন্য আইনের শাসন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিষ্ঠিত আইনী কাঠামো বিদ্যমান থাকা।

৪। প্রশাসনের স্বচ্ছতাসহ আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৫। তথ্য এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা।

৬। একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা যা দক্ষতা এবং কার্যকারিতার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া।

৭। সরকার ও সুশীল সমাজের সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিদ্যমান থাকা।

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) সুশাসনের কিছু নির্দেশকের উল্লেখ করেছে। এগুলো হলো-

১। সরকারের বৈধতা;
২। সরকারের রাজনৈতিক ও সরকারি উপাদানসমূহের জবাবদিহিতা;
৩। নীতিমালা তৈরি ও সেবা সরবরাহের জন্য সরকারের যোগ্যতা এবং
৪। মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা।

বাংলাদেশে সুশাসনের একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সংবিধানে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠার সকল বিষয়াবলির ব্যাপারে বলা থাকলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে এখনও এদেশে প্রকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে **১৯৭৫** সাল থেকে **১৯৯০** সাল পর্যন্ত এই সামরিক শাসনকাল ছিল বাংলাদেশের সুশাসনের পথে অন্তরায়। পরবর্তীতে **১৯৯০** সালে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও এদেশে সরকারসমূহের গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে চলতে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এছাড়া, জনগণের কাছে সংসদের দায়বদ্ধতা এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগের সংসদের কাছে দায়বদ্ধতা এখনও সঠিকভাবে নিশ্চিত হয়নি। বাংলাদেশ অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নের আশানুরূপ সাফল্য লাভ করলেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বল কর্মক্ষমতা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতির অপ্রাতিষ্ঠানিকতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা; নির্বাহী বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ইত্যাদি সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম বাধা।

Worldwide Governance Indicators অনুসারে ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালের দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি, শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নের ছকে বর্ণনা করা হল:

বাংলাদেশে গভর্নেন্সের সূচকসমূহ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
দায়বদ্ধতা	৩০.৫৪	৩০.৫৪	৩০.০৫	২৭.৫৯
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি	১০	১০.৯৫	১০.৪৮	১৩.৮১
শাসনবাবস্থার কার্যকারিতা	২৪.০৪	২৫.৪৮	২২.১২	২১.৬৩
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	২২.১২	১৮.৭৫	১৯.২৩	১৬.৮৩

বাংলাদেশে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ

সুশাসনের লক্ষ্য হলো একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা হলেও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অভাবের কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তবে দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি বাংলাদেশের সুশাসনের সবচেয়ে বড় অন্তরায় যা জনসম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে সমাজে অসমতা বাড়াচ্ছে। এছাড়া গণতন্ত্র এবং সুশাসনের ক্ষেত্রে সরকারের বৈধতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটি দেশের নির্বাচন কমিশন জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনা করে সরকারের বৈধতা নিশ্চিত করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন প্রকৃতার্থে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ না হওয়ার কারণে নির্বাচনকালীন সময়ে রাষ্ট্রে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। এটিও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক বড় বাধা। পাশাপাশি বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা কার্যকরভাবে স্বাধীন না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে আইনের শাসন ব্যাহত হয়। এটিও সুশাসনের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা, রাজনীতি ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সুশাসনের চর্চাকে ব্যাহত করছে। একইভাবে একটি দেশের সুশাসনের জন্য দরকার দক্ষ ও কার্যকরী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কিন্তু স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রকে কাঙ্ক্ষিত মান ও পেশাদারিত্বে উন্নীত করতে

পারেনি। ফলে বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা সব সময় দেশ ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারছে না। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং ক্ষমতার সাথে জন-অংশগ্রহণের অভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনেক উদ্যোগই কার্যকর হতে পারছে না।

বাংলাদেশের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণের উপায়

বাংলাদেশের সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের যেকোনো নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজন করতে পারে। দেশের নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কেবল গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না, সুশাসনকেও সুসংহত করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোকে আরো সক্রিয় করার মাধ্যমে দেশে সুশাসনের চর্চা বৃদ্ধি পেতে পারে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আরো শক্তিশালীকরণ, ক্ষমতা ও নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জন-অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সুশাসনে সহায়ক। সুশাসনের জন্য আমলাতন্ত্রকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করা জরুরি। এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা দরকার। পুলিশ-র‍্যাবসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারণ করে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। অর্পিত দায়িত্ব সততা, নিরপেক্ষতা এবং জবাবদিহিতার সাথে পালন করলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। এজন্য পেশাদারিত্ব, মনোবল, সরকারি সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরীকরণে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক নিম্নমধ্যম আয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে। পাশাপাশি গড় আয়ু, শিক্ষার হার, মানবসম্পদ উন্নয়ন, মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন, মাথাপিছু আয়, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ছেলে-মেয়ের ভর্তির হার, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন সূচকে এসব অগ্রগতি বাংলাদেশের সুশাসনকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারে। সুতরাং দেশে সুশাসনের সম্ভাবনা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আমলাতন্ত্র এবং জনগণের মানসিকতায়ও পরিবর্তন অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ

সুশাসন হলো সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কীভাবে জনসাধারণের বিষয়াদি এবং জনসম্পদকে পরিচালনা করবে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায়। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব সুশাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতাও সুশাসনের পথে অন্তরায়। এই চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণের জন্য প্রয়োজন কার্যকর সংসদ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের (নির্বাচন কমিশন, দুদক) স্বাধীনতা ও সক্রিয়তা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা, তথ্য অধিকার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি সুশাসনকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

পাঠ-৬.৫ বাংলাদেশের পরিবেশ ও উন্নয়ন
Environment and Development of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- পরিবেশ ও উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্দেশকে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন, জলদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ এবং বিপজ্জনক বর্জ্যের কারণে পরিবেশ সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ যা টেকসই উন্নয়নের জন্য হুমকিস্বরূপ। এর ফলে এদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা প্রবেশ এবং জলাবদ্ধতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এই পরিবেশগত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠা জরুরি। আর এই জন্য সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক জোরদারকরণসহ দেশের নীতিনির্ধারকগণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা

C. A. Talmage (২০১৪) উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "উন্নয়ন হলো সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাবের লক্ষ্যে একটি কার্যকর পরিবর্তন প্রক্রিয়া"। এছাড়া D. Rokos তাঁর *Environment and Development. Dialectical Relations and Interdisciplinary Approaches* বইতে বলেছেন, উন্নয়ন হলো মানব সম্পর্ক এবং ভূমি ব্যবহার, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, ব্যবহার এবং বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে একটি নতুন, উন্নত গতিশীল ভারসাম্য যা নাগরিকদের গড় সামাজিক চেতনা অনুসারে শারীরিক ও আর্থ-সামাজিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারকে নিশ্চিত করে। (Development is a new, improved dynamic balance between human relations and systems of land use, production, employment, consumption, and distribution, which aims at the optimal use of physical and socioeconomic resources).

অন্যদিকে Sustainable Development এর 'Sustainability' শব্দ দিয়ে উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে। মূলত ১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশকে 'Sustainability' শব্দটির প্রচলন ঘটে। পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলন যেমন– মানব পরিবেশ সম্পর্কিত জাতিসংঘের সম্মেলন (১৯৭২), পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কমিশন (১৯৮৭), পরিবেশ ও উন্নয়ন শীর্ষক সম্মেলন (১৯৯২), পরিবেশ ও উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশন (১৯৯৭), এবং বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন (২০০২) ইত্যাদির মাধ্যমে Sustainable Development ধারণার অবস্থান পোক্ত হয়। Brundtland's Commission কার্যকরণের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এই কমিশনের লক্ষ্য ছিল- ক) পরিবেশ এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত জটিল বিষয়গুলি বিবেচনা করে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব প্রদান করা এবং খ) গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো যাতে ব্যক্তি, স্বেচ্ছাসেবী, সংস্থা, ব্যবসা, এবং সরকারগুলি আরও নিবিড়ভাবে কাজ করে।

ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি আরও পরিমার্জিত হয়েছে। সরকারের নীতি, ব্যবসায়ের কৌশল এবং এমনকি জীবনধারা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়গুলোও টেকসই উন্নয়নের ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পরিবেশ ও উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশের গুণগত মানের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কারণে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটে। যেমন– বায়ু দূষণ, মাটি ও জলের গুণগতমানের অবনতি, মরুভূমি, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, বৈশ্বিক উষ্ণতা ইত্যাদি বড় পরিবেশগত সমস্যা প্রকট হয়।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি খুব আশাব্যঞ্জক। এছাড়া রেমিট্যান্স, গ্রামীণ আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করছে। তবে টেকসই অর্থনীতি বিকাশের জন্য আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ করা দরকার।

কিন্তু সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশের পরিবেশের অবক্ষয় ঘটছে। পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্য বনায়ন ২৫ শতাংশ হওয়ার কথা থাকলেও বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ১৭.৪৬ শতাংশ। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলসহ অন্যান্য বনভূমি ধংস হচ্ছে। বায়ু মানের উপর সাম্প্রতিক এক বৈশ্বিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশের বায়ু বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি দূষিত। পাশাপাশি, অবৈধভাবে নির্মিত ইটভাটা এবং অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ কোনও প্রকার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অবৈধভাবে নদী ও খাল ভরাট, জীববৈচিত্র্যের নাজুকতা, পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনধারণ ও হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। এ কারণে বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বাভাবিক জীবন পর্যুদস্ত হচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ সমূহ

বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৭) এর মতে, 'যেহেতু দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল, তাই টেকসই পরিবেশগত বিকাশ নিশ্চিত করা জরুরি'। 'ভিশন ২০২১' অনুসারে বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবের সমন্বিত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) হিসাবে সকল মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয় জল এবং স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ (বিসিসিএসএপি ২০০৯) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যেখানে অভিযোজন এবং প্রশমন কার্যক্রম উভয়ই বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) বিসিসিএসএপি ২০০৯ বাস্তবায়নের অভ্যন্তরীণ সংস্থান থেকে গঠিত হয়েছে এবং অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট ৩৩,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তদুপরি সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল আইন ২০১০ কার্যকর করেছে এবং বিসিসিটিএফ-র উন্নত পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ ইতিমধ্যে জাতিসংঘ প্রদত্ত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস (এমডিজি) এর লক্ষ্যসমূহ সফলতার সাথে অর্জন করেছে। পোস্ট ২০১৫ ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা ইতিমধ্যে ভবিষ্যতের রূপরেখা কেমন হবে সে বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এরপর ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭ টি লক্ষ্য এবং ১৬৯ টি টার্গেট অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রাগুলো হল:

০১। দারিদ্র্যের সমাপ্তি;
০২। খাদ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
০৩। স্বাস্থ্যকর এবং সুস্থ জীবন নিশ্চিতকরণ;
০৪। সম্মিলিতভাবে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;
০৫। নারীর ক্ষমতায়ন;
০৬। সবার জন্য নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
০৭। সবার জন্য সাশ্রয়ী, স্থায়ী, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক শক্তি নিশ্চিত করা;
০৮। অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক নিশ্চিতকরণ;

০৯। স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামো নির্মাণ এবং টেকসই শিল্পায়নের প্রচার;
১০। দেশের আয়ের বৈষম্য হ্রাস করা;
১১। স্থিতিস্থাপক, নিরাপদ এবং টেকসই শহর ও মানব বসতি অন্তর্ভুক্তি;
১২। টেকসই উৎপাদন এবং খরচ নিশ্চিত করা;
১৩। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং এর প্রভাবগুলির বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া;
১৪। সমুদ্র, মহাসাগর এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ করা;
১৫। স্থিতিশীল বাস্তুসংস্থানগুলি পুনরুদ্ধার, সুরক্ষা এবং নিশ্চিতকরণ;
১৬। শান্তিপূর্ণ সমাজ অর্জনের জন্য পদোন্নতি, টেকসই উন্নয়ন, সবার জন্য বিচারের নিশ্চিতকরণ;
১৭। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব;

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ভলেন্টারি ন্যাশনাল রিভিউ-এ অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহকে (এসডিজি) একীভূত করেছে এবং এতে ১১ টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং, উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং জাতীয় পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রবর্তন করেছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ সরকার এনজিও, উন্নয়ন অংশীদারগণ, বেসরকারী খাত, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে।

পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার কারণে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বর্তমানে মাটি, পানি এবং বায়ু দূষণ টেকসই উন্নয়নের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। অবৈধভাবে নির্মিত ইটভাটা, অবকাঠামো প্রকল্প, নদী ও খাল ভরাট, বনভূমি ধ্বংস করে সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্প, অব্যবস্থাপনা পরিবেশের ক্ষতি করছে। যার ফলে বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনা করে নীতি-নির্ধারকদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

সারসংক্ষেপ:

একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সেই দেশের পরিবেশ সংরক্ষণও জরুরি। কেননা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কারণে বায়ু দূষণ, মাটি ও জলের গুণগতমানের অবনতি, মরুভূমি, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, বৈশ্বিক উষ্ণতা ইত্যাদি পরিবেশগত সমস্যা প্রকট। বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ভিশন ২০২১ অনুসারে বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবের সমন্বিত বিভিন্ন কর্মসূচি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহকে (এসডিজি) একীভূত করা, জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা প্রভৃতি। কিন্তু সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও বনভূমি ধ্বংস করে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্প, বায়ু দূষণ, অবৈধভাবে নদী ও খাল ভরাট, পরিবেশ সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করছে। উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে সরকারকে এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(Discuss about different political regimes in Bangladesh.)

২. বাংলাদেশের সামরিক শাসনকাল মূল্যায়ন করুন।
(Evaluate the military regime of Bangladesh.)

৩. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর স্তরসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
(Discuss in detail about the levels of administrative structure of Bangladesh.)

৪. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(Discuss the challenges of the administrative structure of Bangladesh.)

৫. ই-গভর্নেন্সের প্রকৃতি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন।
(Discuss the nature of E-governance in the context of Bangladesh.)

৬. বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের কার্যক্রম মূল্যায়ন করুন।
(Evaluate E-governance activities in Bangladesh.)

৭. বাংলাদেশে সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
(Discuss in detail about the challenges of good governance in Bangladesh.)

৮. বাংলাদেশে সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো থেকে উত্তরণের উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন।
(Discuss the ways to overcome the challenges of good governance in Bangladesh.)

৯. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
(Discuss in details about the relationship between environment and development in the context of Bangladesh.)

১০. বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
(Briefly discuss the steps taken by the government to protect the environment of Bangladesh.)

১১. টীকা লিখুন (Write Short Notes):

i. ঐকমত্যের সরকার (Consensus Government)
ii. বেসামরিকীকরণ (Decivilianization)
iii. কেন্দ্রীয় প্রশাসন (Central Administration)
iv. মাঠ প্রশাসনের স্তর (Level of Field Administration)
v. ই-গভর্নেন্স (E-Governance)
vi. ই-গভর্নেন্সের প্রকৃতি (The Nature of E-governance)
vii. সুশাসন (Good Governance)
viii. সুশাসনের নির্দেশক (Indicators of Good Governance)
ix. উন্নয়ন (Development)
x. টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development)